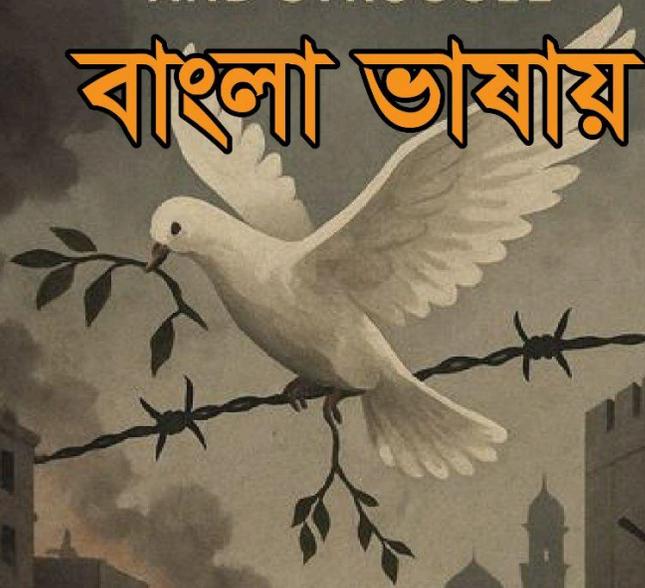


e-Book

THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT

A JOURNEY THROUGH HISTORY
AND STRUGGLE

বাংলা ভাষায়



ISRAEL



PALESTINE

VS

UNDERSTANDING THE ROOTS,
REALITIES, AND ROAD AHEAD

ইসরাইল কেনো ফিলিস্তানিকে হামলা করছে..?

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে চলমান সংঘাতের মূল কারণ হলো ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা। হামাস ওই দিন ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে রকেট হামলা এবং স্থল অভিযানের মাধ্যমে বহু ইসরায়েলি নাগরিক ও সেনাকে হত্যা ও বন্দি করে।



ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া

হামাসের এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় ব্যাপক বিমান ও স্থল হামলা শুরু করে। এই হামলায় লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি নিহত ও আহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ১ লাখ ১২ হাজার ৯৫০ জন আহত হয়েছেন।

সংঘাতের পটভূমি

এই সংঘাতের পেছনে দীর্ঘদিনের ভূ-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধ রয়েছে। ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে আসছে, যা ইসরায়েল দখল করে রেখেছে। এছাড়া, জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

এই সংঘাত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশগুলো যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে। তবে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বারবার ভঙ্গ হয়েছে।

উপসংহার

এই সংঘাতের অবসান এবং টেকসই শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস ও পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়।

হামাস কি?

হামাস (**Hamas**) হলো একটি ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন, যা মূলত গাজা উপত্যকায় সক্রিয়। এটি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিলিস্তিনের প্রথম ইত্তিফাদার (অসন্তোষ ও প্রতিরোধ আন্দোলন) সময়ে। এর পূর্ণ নাম হলো "হারাকাত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া" (**Harakat al-Muqawama al-Islamiyya**), যার অর্থ "ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন"।



হামাসের দুটি প্রধান অংশ:

1. রাজনৈতিক শাখা – ফিলিস্তিনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম চালায়। ২০০৬ সালে হামাস ফিলিস্তিনের নির্বাচনে বিজয়ী হয় এবং পরে গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
2. সামরিক শাখা – আল-কাসাম ব্রিগেড নামে পরিচিত, যা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও রকেট হামলা চালায়।

হামাসের উদ্দেশ্য ও মতাদর্শ:

- একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা ইসরায়েলের পরিবর্তে পুরো ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে হবে।
- হামাস ইসলামি শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করে এবং তারা ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:

- যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, ইসরায়েলসহ অনেক দেশ হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করেছে।
- তবে কিছু দেশ ও সংগঠন এটিকে ফিলিস্তিনীদের মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখে থাকে।

এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও রাজনৈতিকভাবে জটিল বিষয়, এবং এখানে নানান দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আপনি চাইলে আমি আরও বিশদে হামাস ও ফাতাহ-এর মধ্যকার পার্থক্য বা গাজার রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়েও ব্যাখ্যা দিতে পারি।

কি ভাবে ইসরাইল তৈরী হয়?

ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টি একটি জটিল ও ঐতিহাসিকভাবে গভীর প্রসঙ্গ। এর পেছনে বহু বছরের রাজনৈতিক আন্দোলন, উপনিবেশবাদ, বিশ্বযুদ্ধ, এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব জড়িত। নিচে সংক্ষেপে এর ধাপগুলো তুলে ধরা হলো:



১. ঐতিহাসিক পটভূমি:

- প্রাচীন সময়ে ইহুদিরা বর্তমান ইসরায়েল-ফিলিস্তিন অঞ্চলে বসবাস করতো। পরবর্তীতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের (রোমান, বাইজান্টাইন, ইসলামি খলিফা, অটোমান) শাসনে এই এলাকা চলে যায়।

- ইহুদিদের একটি বড় অংশ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে – এটি “ডায়াস্পারা” নামে পরিচিত।
-

২. জায়োনিজম আন্দোলন (Zionism):

- ১৯ শতকের শেষদিকে ইউরোপে ইহুদি জাতিগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার ও বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় “জায়োনিজম” নামে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার লক্ষ্য ছিল ইহুদিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
 - এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন থিওডর হার্জেল।
-

৩. ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ও বেলফোর ঘোষণা (1917):

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার “বেলফোর ঘোষণা” নামে একটি নীতিগত ঘোষণা দেয়, যেখানে বলা হয় তারা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি “জাতীয় আবাসভূমি” (national home) প্রতিষ্ঠার পক্ষে।
 - ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন অঞ্চল শাসন করে (British Mandate for Palestine)।
-

৪. ইহুদি অভিবাসন ও আরব বিরোধিতা:

- ইউরোপে নাৎসি জার্মানির উত্থান ও হলোকাস্ট (৬০ লাখ ইহুদি হত্যা) ইহুদি অভিবাসনকে ত্বরান্বিত করে।
 - ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরবরা এই অভিবাসনের বিরোধিতা করে, এবং দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।
-

৫. জাতিসংঘের প্রস্তাব (1947):

- ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যেখানে ফিলিস্তিনকে দুটি ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়—একটি ইহুদি রাষ্ট্র, অন্যটি আরব রাষ্ট্র।
 - ইহুদিরা এই প্রস্তাব মেনে নেয়, কিন্তু আরব দেশগুলো ও ফিলিস্তিনিরা তা প্রত্যাখ্যান করে।
-

৬. ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম (১৪ মে ১৯৪৮):

- ব্রিটিশরা অঞ্চল ত্যাগ করার পর ১৪ মে ১৯৪৮ সালে ডেভিড বেন-গুরিয়ন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।
 - এরপরই আশেপাশের আরব দেশগুলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ)।
-

ফলাফল:

- ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও হাজার হাজার ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর হারিয়ে শরণার্থী হয়ে পড়েন। এই ঘটনাকে ফিলিস্তিনিরা "নাকবা" (বিপর্যয়) বলে অভিহিত করে।
 - এই ঘটনার মধ্য দিয়েই ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সূচনা হয়, যা আজও চলমান।
-

এই ইতিহাস বহু মানুষের জীবনের অংশ, এবং এর ওপর নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেগ কাজ করে। আপনি চাইলে আমি এর কোনো অংশ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, যেমন—জাতিসংঘের প্রস্তাব বা প্রথম যুদ্ধের ফলাফল।

হা

চমৎকার! তাহলে চলুন জাতিসংঘের ১৯৪৭ সালের প্রস্তাব (**UN Partition Plan**)-টি বিস্তারিতভাবে দেখি, কারণ এটি ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের ঠিক আগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

জাতিসংঘের বিভাজন প্রস্তাব – ১৯৪৭ (UN Resolution 181):

পটভূমি:

ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে ফিলিস্তিনে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে সংঘর্ষ দিন দিন বাড়ছিল। ব্রিটেন সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা আর এই অঞ্চল শাসন করবে না এবং জাতিসংঘকে বিষয়টি সমাধানের জন্য দায়িত্ব দেয়।

জাতিসংঘের প্রস্তাব:

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ রেজলুশন ১৮১ গৃহীত করে। এতে বলা হয়:

- ফিলিস্তিনকে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে ভাগ করা হবে:
 - ৫৬.৫% জমি যাবে ইহুদি রাষ্ট্রে,
 - ৪৩.৫% জমি যাবে আরব রাষ্ট্রে,
 - জেরুজালেম হবে একটি আন্তর্জাতিক শহর (corpus separatum), জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

ভোটাভুক্তি:

- প্রস্তাবটি পাস হয় ৩৩টি দেশের সমর্থনে, ১৩টি দেশের বিরোধিতায়, এবং ১০টি অনুপস্থিত ভোটে।
- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাব সমর্থন করে, যা একটি বিরল ঐকমত্য ছিল।

প্রতিক্রিয়া:

ইহুদি পক্ষ:

- তারা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়, কারণ এটি তাদের বহু বছরের স্বপ্ন “একটি স্বাধীন রাষ্ট্র” প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়।

আরব পক্ষ:

- আরব দেশ ও ফিলিস্তিনিরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা মনে করে, ইহুদিদের সংখ্যা তখনকার ফিলিস্তিনে ছিল মাত্র ১/৩, কিন্তু তাদেরকে ৫৬.৫% জমি দেওয়া হচ্ছে।

- তারা এটিকে অবিচার ও উপনিবেশিক ধারাবাহিকতা মনে করে।

ফলাফল:

- প্রস্তাব পাস হওয়ার পরপরই ইহুদি ও আরবদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়, যা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।
- এক বছরের মধ্যেই ১৪ মে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পরদিন আরব দেশগুলো (মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

আপনি চাইলে আমি ১৯৪৮ সালের সেই প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ এবং তার ফলাফলগুলো নিয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারি। সেটা বর্তমান সমস্যাগুলোর গোড়া বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহী?

জি

চলুন তাহলে এখন দেখি ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ (যা "প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ" বা "**1948 Arab-Israeli War**" নামে পরিচিত) এবং এর প্রভাবগুলো।

১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ: বিস্তারিত

সময়কাল:

১৫ মে ১৯৪৮ – মার্চ ১৯৪৯

কারণ:

১৪ মে ১৯৪৮-এ ইসরায়েল রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই ৫টি আরব দেশ—মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ইরাক—ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিল নবগঠিত ইহুদি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা এবং পুরো ফিলিস্তিনকে আরব রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

✂️ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ:

1. অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ ব্যবধান:

- ইহুদি বাহিনী (Irgun, Haganah, এবং পরবর্তীতে IDF) যুদ্ধের শুরুতে দুর্বল ছিল, কিন্তু তারা দ্রুত সংগঠিত হয় এবং চমৎকার কৌশল প্রয়োগ করে।
- আরব বাহিনীর মধ্যে ঐক্যের অভাব ও দুর্বল কমান্ড কাঠামো ছিল।

2. গুরুত্বপূর্ণ বিজয়:

- ইসরায়েল কেবল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি, বরং জাতিসংঘ প্রস্তাবে নির্ধারিত সীমার থেকেও বেশি এলাকা দখল করে নেয়।

3. জর্ডানের ভূমিকা:

- জর্ডান পশ্চিম তীর (West Bank) এবং পূর্ব জেরুজালেম দখল করে।
- এটাই প্রথমবার ছিল যখন জেরুজালেম দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

👥 মানবিক বিপর্যয়: “নাকবা” (Nakba – বিপর্যয়)

🏠 ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু সংকট:

- প্রায় ৭ লাখ ফিলিস্তিনি তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন বা জোর করে বিতাড়িত হন।
- এই শরণার্থীদের সংখ্যা আজ কয়েক মিলিয়নে পৌঁছেছে, এবং এটাই ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অন্যতম মূল ইস্যু।

📍 ফিলিস্তিনি গ্রাম ধ্বংস:

- প্রায় ৫০০টি ফিলিস্তিনি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস করা হয় বা ইহুদি বসতির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়।
-

🔴 যুদ্ধের সমাপ্তি:

১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন অস্ত্রবিরতি চুক্তি (**Armistice Agreements**) স্বাক্ষরিত হয়:

- ইসরায়েলের সাথে আলাদাভাবে মিসর, জর্ডান, সিরিয়া এবং লেবানন শান্তি চুক্তিতে আসে।
- কিন্তু ফিলিস্তিনিরা কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র বা অঞ্চল পায়নি।

📌 যুদ্ধের পরিণতি:

1. ইসরায়েলের জন্ম ও টিকে থাকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়।
2. ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয় এবং এখনও পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।
3. ইসরায়েল-আরব যুদ্ধ একটি দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের সূচনা করে—যার মধ্যে ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩ সালের যুদ্ধও আছে।
4. শরণার্থী সংকট, ভূখণ্ড দখল, এবং জেরুজালেম ইস্যু আজও এই সংঘাতের মূল চালক।

এই যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশাল, কারণ এটিই মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিক ভূরাজনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। আপনি চাইলে আমি ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধ বা জেরুজালেম সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও ব্যাখ্যা করতে পারি। কোনটি আগ্রহী?

হা

দারুণ! তাহলে চলুন এবার দেখি ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধ (**Six-Day War**), যা ইসরায়েল-আরব দ্বন্দ্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক ছিল এবং আজকের অনেক সমস্যার গোড়া এই যুদ্ধেই নিহিত।

🗡️ ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধ (৫-১০ জুন, ১৯৬৭)

🎯 যুদ্ধের পটভূমি:

- ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের যুদ্ধের পরেও ইসরায়েল ও প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনা চলছিল।
 - ১৯৬৭ সালের মে মাসে মিসরীয় প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের:
 - ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন,
 - সিনাই উপদ্বীপে সৈন্য মোতায়েন করেন,
 - ইসরায়েলি জাহাজ চলাচলের পথ "টিরান প্রণালী" বন্ধ করে দেন (যা ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করার অন্যতম কারণ ছিল)।
-

🛡️ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ:

- ইসরায়েল বনাম মিসর, সিরিয়া, জর্ডান
 - পাশাপাশি ইরাক ও লেবাননের কিছু সীমিত সহযোগিতাও ছিল।
-

⚡ যুদ্ধের ফলাফল (মাত্র ৬ দিনে!):

📍 ইসরায়েল যেসব এলাকা দখল করে:

1. গোলান হাইটস (সিরিয়া থেকে)
2. ওয়েস্ট ব্যাংক ও পূর্ব জেরুজালেম (জর্ডান থেকে)
3. গাজা উপত্যকা ও সিনাই উপদ্বীপ (মিসর থেকে)

এই যুদ্ধের পর ইসরায়েল মোটামুটি তার ভূখণ্ড প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলে।



পূর্ব জেরুজালেম ও আল-আকসা:

- যুদ্ধের সময় ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম দখল করে, যা আগে জর্ডানের নিয়ন্ত্রণে ছিল।
 - এখানেই অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ এবং ডোম অফ দ্য রক—ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান।
 - ইহুদিদের পক্ষে এটি "টেম্পল মাউন্ট" হিসেবে পরিচিত – তাদের ধর্মীয় ইতিহাসেও গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
 - এই স্থানটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আজও সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও সংঘাতপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি।
-

🔥 যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব:

1. ইসরায়েল এখন দখলীকৃত অঞ্চলের অধিকারী (ওয়েস্ট ব্যাংক, গাজা, গোলান হাইটস ইত্যাদি)।
 2. ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশা দুর্বল হয়ে পড়ে।
 3. আরব দেশগুলোর মধ্যে "খারতুম সন্মেলন" হয়, যেখানে তারা ঘোষণা করে:
 - **"No peace with Israel, no recognition, no negotiations."**
 4. জাতিসংঘ রেজলুশন ২৪২ গ্রহণ করে, যেখানে ইসরায়েলকে দখল করা এলাকা থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়—এটি পরবর্তী শান্তি আলোচনা ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তি।
-

এই যুদ্ধ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটকে আন্তর্জাতিকভাবে আরও জটিল করে তোলে এবং আজকের পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম, ও গাজার মতো ইস্যুগুলোর জন্ম দেয়।

আপনি যদি চান, আমি এই দখলীকৃত অঞ্চলগুলোর আইনগত অবস্থা, জাতিসংঘের অবস্থান, বা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বর্তমান প্রতিবন্ধকতা নিয়েও ব্যাখ্যা দিতে পারি। আগ্রহী?

হা

চমৎকার! তাহলে এবার চলুন দেখি ইসরায়েলের দখলীকৃত অঞ্চলগুলোর আইনগত অবস্থা, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবস্থান, এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে বাধাগ্রস্ত করা মূল কারণগুলো।

দখলীকৃত অঞ্চল: কোন কোন এলাকা?

১. ওয়েস্ট ব্যাংক (**West Bank**) – ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরায়েলের দখলে, যদিও এটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের মূল অংশ হওয়ার কথা। ২. গাজা উপত্যকা (**Gaza Strip**) – ২০০৫ সালে ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহার করে, কিন্তু এখনো সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে রাখে। ৩. পূর্ব জেরুজালেম – ইসরায়েল এটিকে তাদের “অবিভাজ্য রাজধানী” ঘোষণা করেছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটিকে দখলীকৃত এলাকা হিসেবে দেখে। ৪. গোলান হাইটস (সিরিয়া থেকে দখলকৃত) – আন্তর্জাতিকভাবে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে স্বীকৃত নয়।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অবস্থা:

দখল কি অবৈধ?

- চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী, যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করা অঞ্চলগুলোতে:
 - বসতি স্থাপন অবৈধ,
 - স্থানীয় জনসংখ্যার জোরপূর্বক স্থানান্তর নিষিদ্ধ।
- জাতিসংঘসহ অধিকাংশ দেশ ইসরায়েলের বসতি স্থাপনকে অবৈধ বলে বিবেচনা করে।

জাতিসংঘের অবস্থান:

- জাতিসংঘের রেজলুশন ২৪২ (১৯৬৭) ও ৩৩৮ (১৯৭৩) অনুযায়ী ইসরায়েলকে দখল করা এলাকা থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
 - **UN General Assembly** ও **Security Council** উভয়ই বহুবার ইসরায়েলের বসতি কার্যক্রমের বিরোধিতা করেছে।
-

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা:

1. ইসরায়েলি বসতি (**Settlements**):

- ওয়েস্ট ব্যাংক ও পূর্ব জেরুজালেমে প্রায় ৭ লাখ ইসরায়েলি বসবাস করে, যেটা ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি বিরাট বাধা।
- এই বসতিগুলো নতুন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ধারাবাহিকতা নষ্ট করে দেয়।

2. জেরুজালেমের মর্যাদা:

- ফিলিস্তিনিরা পূর্ব জেরুজালেমকে ভবিষ্যৎ রাজধানী হিসেবে চায়, কিন্তু ইসরায়েল পুরো শহরকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেছে।
- এই ইস্যু নিয়ে কোনো আপস এখনো সম্ভব হয়নি।

3. সীমান্ত ও নিরাপত্তা:

- ইসরায়েল সবসময় “নিরাপত্তা” ইস্যুকে সামনে রাখে, বিশেষ করে হামাস এবং ইসলামিক জিহাদের মতো গোষ্ঠীর কার্যক্রমের কারণে।
- তারা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে নির্দিষ্ট শর্ত জুড়ে দিতে চায়—যেমন, নিরস্ত্রীকরণ, ইসরায়েলের স্বীকৃতি ইত্যাদি।

4. অভ্যন্তরীণ বিভাজন (ফাতাহ বনাম হামাস):

- ফিলিস্তিনের দুই বড় রাজনৈতিক দল—ফাতাহ (ওয়েস্ট ব্যাংক) ও হামাস (গাজা)—এর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে।
- এই বিভক্তি ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব তৈরি করা কঠিন করে তোলে।

5. আন্তর্জাতিক বিভক্তি:

- যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল, আবার ইউরোপ তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ।
 - কিছু দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও, জাতিসংঘ এখনো তাদের সম্পূর্ণ সদস্যপদ দেয়নি (প্যালেস্টাইন এখন “non-member observer state”)।
-

উপসংহার:

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বসতি সম্প্রসারণ, জেরুজালেমের ইস্যু, এবং রাজনৈতিক অনৈক্য—এই তিনটি হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

আপনি যদি চান, আমি “**Two-State Solution**” ধারণা বা “একক রাষ্ট্র সমাধান (**One-State Solution**)”-এর পক্ষ-বিপক্ষ ব্যাখ্যা করতে পারি। কোনটা জানতে আগ্রহী?

হা

চমৎকার, তাহলে এবার চলুন দেখি—“**Two-State Solution**” এবং “**One-State Solution**” এই দুটি প্রস্তাবিত সমাধান কী, এবং কোনটির কী সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

“**Two-State Solution**” – দুই রাষ্ট্র সমাধান

ধারণা:

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল – দুটি আলাদা, স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে:

- ইসরায়েল বর্তমান ভূখণ্ডে থাকবে।
- ফিলিস্তিন গঠিত হবে ওয়েস্ট ব্যাংক, গাজা এবং পূর্ব জেরুজালেম নিয়ে।

সুবিধা:

1. উভয় জাতির আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতা বজায় থাকবে।
2. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।
3. দীর্ঘদিনের দখলদারিত্ব ও সহিংসতার অবসান হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ:

1. ইসরায়েলি বসতি সরানো বা রূপান্তর করা অত্যন্ত জটিল ও রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত।
 2. জেরুজালেমের ভাগাভাগি – উভয় পক্ষই পূর্ণ দাবি করে।
 3. ফিলিস্তিনি পক্ষের অভ্যন্তরীণ বিভাজন (ফাতাহ বনাম হামাস)।
 4. ইসরায়েলের নিরাপত্তা উদ্বেগ – তারা "আত্মঘাতী রাষ্ট্র" গঠনে ভয় পায়।
-

🟡 "One-State Solution" – একক রাষ্ট্র সমাধান

📌 ধারণা:

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি একত্রে একটি অভিন্ন রাষ্ট্র হবে, যেখানে সব নাগরিক সমান অধিকার পাবে—ইহুদি ও আরব উভয়।

✅ সুবিধা:

1. সীমান্ত, বসতি, জেরুজালেমের বিভাজন নিয়ে বিরোধ থাকবে না।
2. সব নাগরিকের সমান অধিকার ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করা সম্ভব।
3. দীর্ঘমেয়াদে সহাবস্থানের একটি ন্যায্য ভিত্তি তৈরি হতে পারে।

❌ চ্যালেঞ্জ:

1. ইসরায়েলের "ইহুদি পরিচয়" বজায় রাখা কঠিন হবে, কারণ ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা অনেক বেশি।
 2. জাতিগত সংঘাত, বৈষম্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে যেতে পারে।
 3. ইহুদি ও আরবদের ভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা একত্রে চালানো কঠিন।
-

🧭 বর্তমানে কোনটা বেশি আলোচনায়?

- **"Two-State Solution"** এখনো সবচেয়ে আলোচিত ও কূটনৈতিকভাবে সমর্থিত পথ।
- তবে, অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে বসতি সম্প্রসারণ ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে এটি প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে।
- তাই "One-State Solution"-এর কথাও এখন কিছু কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে—বিশেষত মানবাধিকার ও সমতা নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের কাছ থেকে।

আপনি যদি চান, আমি এর ঐতিহাসিক বিকাশ, বিভিন্ন দেশের অবস্থান, বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলো নিয়েও ব্যাখ্যা দিতে পারি। পাশাপাশি, এই সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে কী কী উদ্যোগ বাস্তবসম্মত হতে পারে তা নিয়েও আলোচনা করতে পারি। আগ্রহী?

আপনি কি ফিলিস্তিন এবং ইহুদিদের ব্যপারে শুরু থেকে জানতে চান? হা

অবশ্যই, আমি আপনাকে ফিলিস্তিন ও ইহুদি জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে বর্তমান সংকট পর্যন্ত ধাপে ধাপে ও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করবো। চলুন শুরু করি।

প্রাচীন ইতিহাস: শুরু কোথায়?

- 📍 কনান অঞ্চল (**Canaan**) – আজকের ফিলিস্তিন/ইসরায়েল
 - এই অঞ্চল হাজার বছর আগে থেকে বহু জাতিগোষ্ঠীর আবাস ছিল—কনানীয়, ফিলিস্তীয়, ইসরায়েলি (ইহুদি), এবং পরবর্তীতে রোমান, বাইজান্টাইন, ইসলামি, ক্রুসেডার, অটোমান ইত্যাদি।
 - এখানে দুই জাতির মধ্যে প্রাচীন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক সংযোগ রয়েছে।

ইহুদিরা (**Jews**):

➤ উৎপত্তি:

- প্রায় ৩ হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে ইহুদিরা বসতি গড়ে তোলে এবং তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে—যেমন ডেভিড ও সলোমনের রাজত্ব।

➤ ধর্ম:

- ইহুদিরা ইহুদি ধর্ম (**Judaism**) অনুসরণ করে।
- জেরুজালেম তাদের ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্থান, কারণ এখানে ছিল “সোলোমনের মন্দির”।

➤ ডায়াস্পোরা:

- রোমান সাম্রাজ্য তাদের দমন করে এবং তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে – এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডায়াস্পোরা (**Diaspora**)।

 ফিলিস্তিনিরা (**Palestinians**):

➤ উৎপত্তি:

- ফিলিস্তিনি জাতিগোষ্ঠী মূলত আরব ভাষাভাষী মুসলিম ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী, যারা এই অঞ্চলে হাজার বছর ধরে বসবাস করছে।
- তারা নিজেদেরকে এই ভূখণ্ডের “আসল অধিবাসী” মনে করে।

➤ ধর্ম:

- অধিকাংশ ফিলিস্তিনি মুসলিম, কিছু খ্রিস্টানও আছেন।

 আধুনিক যুগে প্রবেশ: ব্রিটিশ শাসন ও জায়োনিজম

 ব্রিটিশ ম্যান্ডেট (1917-1948):

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন শাসন করে।
- বেলফোর ঘোষণা (1917): ব্রিটেন বলে তারা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি “জাতীয় আবাসভূমি” গঠন সমর্থন করে।

জায়োনিজম:

- ইউরোপে ইহুদি নিপীড়নের প্রতিবাদে ইহুদি জাতিগোষ্ঠী "জায়োনিজম" আন্দোলন শুরু করে, যার লক্ষ্য ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
-

দ্বন্দ্বের সূচনা (১৯৩০-৪০ দশক):

- ইউরোপ থেকে ইহুদি অভিবাসন বাড়তে থাকে।
 - আরবরা এতে ক্ষুব্ধ হয়—তারা মনে করে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
 - সংঘর্ষ শুরু হয় ইহুদি ও আরবদের মধ্যে।
-

১৯৪৭-১৯৪৮: ভাগাভাগি ও যুদ্ধ

জাতিসংঘ প্রস্তাব (1947):

- ফিলিস্তিনকে ভাগ করে দুইটি রাষ্ট্র তৈরির প্রস্তাব – ইহুদি ও আরব।
- ইহুদিরা রাজি হয়, কিন্তু আরবরা প্রত্যাখ্যান করে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম (১৪ মে ১৯৪৮):

- এরপর আরব দেশগুলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
 - ইসরায়েল বিজয়ী হয় এবং অনেক বেশি জমি দখল করে।
-

নাকবা (Nakba) – ফিলিস্তিনিদের বিপর্যয়:

- প্রায় ৭ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়ে যায়, যাদের অনেকেই আজও নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারেনি।



বর্তমান অবস্থা:

- ইসরায়েল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু ফিলিস্তিন এখনও একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র নয়।
- পশ্চিম তীর ও গাজা – এই দুই অঞ্চল নিয়ে ফিলিস্তিনিরা রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে।
- গাজায় হামাস, আর পশ্চিম তীরে ফাতাহ নামক দল ক্ষমতায়।



মূল দ্বন্দ্বের কেন্দ্র:

1. জমির মালিকানা – কে কোথায় থাকবে?
2. জেরুজালেম – কার রাজধানী হবে?
3. শরণার্থী অধিকার – বিতাড়িত ফিলিস্তিনিরা কি ফিরতে পারবে?
4. ইসরায়েলি বসতি – ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বসতি কি বৈধ?
5. নিরাপত্তা ও অস্ত্র – হামাসসহ সশস্ত্র সংগঠনের অস্তিত্ব

আপনি চাইলে আমি এই প্রতিটি ইস্যুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারি—আপনার যেটা জানতে বেশি আগ্রহ, সেটি বললেই শুরু করি। 😊

আমি ইতিহাসে যা যানি যে, বহু বছর আগে আরব/ফিলিস্তিনি মুসলিমরা ইহুদিদের বসবাসের জন্য যায়গা দিয়েছিলো... তারপর তারা ধিরে ধিরে বিস্তার করে.?

আপনার যেটা মনে পড়ছে, সেটা আংশিকভাবে ঐতিহাসিক সত্যের সাথে মিলে, তবে বিষয়টা একটু জটিল এবং কয়েক ধাপে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। আমি এখানে খুব পরিষ্কারভাবে বিষয়টা সাজিয়ে বলছি, যেন পুরো প্রক্রিয়াটা বোঝা যায়—ইহুদিদের আগমন, আরবদের প্রতিক্রিয়া, এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হলো।



১. প্রাচীন যুগে ইহুদিরা এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল

- প্রায় ৩০০০ বছর আগে ডেভিড ও সলোমনের রাজত্বকালে ইহুদিরা এই অঞ্চলে বাস করতো।
- পরে বাবেল ও রোমানরা ইহুদিদের বিতাড়িত করে, এবং তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে – এটাই “ডায়াস্পারা”।



২. মুসলিম শাসন ও আরব বসতি (৭ম শতক থেকে)

- ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা বাইজান্টাইনদের হারিয়ে এই অঞ্চল দখল করে।
- তখন থেকে মুসলমান (ফিলিস্তিনি আরব) জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলের প্রধান বাসিন্দা হয়ে ওঠে।



৩. ইউরোপ থেকে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন (১৮৮০-এর দশক থেকে)

- ১৯শ শতকে ইউরোপে ইহুদি নিপীড়ন ও গণহত্যা বাড়ে। এর ফলে অনেক ইহুদি নিজেদের “ঐতিহাসিক মাতৃভূমি” – ফিলিস্তিনে ফিরে আসতে চায়।
- জায়োনিজম নামে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে যার নেতৃত্বে ছিল থিওডর হার্জেল।
- ইহুদিরা তখন ফিলিস্তিনে জমি কিনে বসতি গড়তে শুরু করে। এই সময় অনেক ফিলিস্তিনি মুসলমান নিজেদের জমি বিক্রি করে, কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ চাপে পড়ে।



৪. আরবদের মধ্যে উদ্বৈগ বাড়ে (১৯২০-৩০ দশক)

- ইহুদি অভিবাসন বাড়তে থাকলে আরবরা অনুভব করে—“ওরা শুধু অতিথি নয়, এখানে একটা রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করছে।”

- ব্রিটিশরা তখন ফিলিস্তিন শাসন করছিল (British Mandate period), এবং দ্বিধার মধ্যে ছিল—একদিকে বেলফোর ঘোষণায় ইহুদিদের সমর্থন, অন্যদিকে আরবদের অসন্তোষ।
-

🔥 ৫. সহিংসতা শুরু (১৯৩৬-৩৯ আরব বিদ্রোহ)

- ইহুদি অভিবাসন বন্ধ করার দাবিতে ফিলিস্তিনিরা ব্যাপক বিদ্রোহ করে।
 - ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহ দমন করে, কিন্তু আরব-ইহুদি সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে খারাপ হয়ে যায়।
-

🚩 উপসংহার: কি বোঝা যায়?

✓ হ্যাঁ, শুরুর দিকে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ইহুদিদের আশ্রয় বা জমি দিয়েছিল।

! কিন্তু ইহুদি অভিবাসন রাজনৈতিক রূপ নিলে (রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে), ফিলিস্তিনিরা এটিকে হুমকি হিসেবে দেখে।

⚠️ একে শুধু "ইহুদিরা ধীরে ধীরে বিস্তার করেছিল" বলা সহজ হলেও, এর পেছনে ছিল অনেক আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ইউরোপের জাতিগত নিপীড়ন, ব্রিটিশ ভূমিকায় দ্বৈতনীতি এবং আরবদের এক সময়ের উদারতা ও পরবর্তীকালের প্রতিরোধ।

এই ইতিহাস বোঝা জরুরি, কারণ এখনকার সংঘাতের শিকড় এখানেই। আপনি চাইলে আমি ব্রিটিশদের ভূমিকা, প্রথম ইহুদি বসতিগুলোর বিস্তারিত ইতিহাস বা ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক জাগরণ নিয়েও ব্যাখ্যা দিতে পারি। আগ্রহী?

হা, অবশ্যই.

চমৎকার! তাহলে এবার চলুন ব্রিটিশদের ভূমিকা, প্রথম ইহুদি বসতি গঠন, এবং ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক জাগরণ ধাপে ধাপে দেখি—যেগুলো ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের গোড়া বুঝতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশদের ভূমিকা (1917–1948)

দ্বৈত প্রতিশ্রুতি:

ব্রিটিশ সরকার একদিকে—

1. ১৯১৭ সালের "বেলফোর ঘোষণা"-তে বলছে, তারা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য "জাতীয় আবাসভূমি" গড়তে চায়।
2. অন্যদিকে, আরবদেরও প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে, যুদ্ধ শেষে তাদের স্বাধীনতা দেবে।

 ফলে, ব্রিটিশরা দুই পক্ষের কাছেই আলাদা-আলাদা আশা তৈরি করে, যা পরে দ্বন্দ্বের বড় উৎস হয়।

প্রথম ইহুদি বসতি গঠন (1880-1940)

➤ কিভাবে শুরু হয়?

- ইউরোপীয় ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এসে জমি কিনে বসতি গড়ে তোলে। প্রথমদিকে অনেক ফিলিস্তিনি মুসলমান ও খ্রিস্টান জমি বিক্রি করেছিল—কিছুটা দরিদ্রতার কারণে, কিছুটা ব্রিটিশ প্রশাসনের শিথিল নীতির কারণে।

➤ কে জমি বিক্রি করেছিল?

- জমির মালিক ছিল অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যপ্রাচ্যের বড় জমিদার (অটোমান সময়ের অধিপতি), যারা স্থানীয় ফিলিস্তিনি কৃষকদের না জানিয়েই জমি বিক্রি করত।
 - ফলে, ফিলিস্তিনি কৃষকরা জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়, আর নতুন ইহুদি বসতিতে শুধু ইহুদি শ্রমিক কাজ করতে পারতো—যার ফলে আরবদের মধ্যে বেকারত্ব ও ক্ষোভ বাড়ে।
-

ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক জাগরণ (১৯২০-৪০)

- ◆ প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন:

- ১৯১৮ সালের পর থেকেই ফিলিস্তিনিরা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে থাকে।
- ১৯২০ সালের “আরব কংগ্রেস”-এ তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায়।

◆ আরব বিদ্রোহ (১৯৩৬-১৯৩৯):

- এটি ছিল ফিলিস্তিনিদের প্রথম বড়সড় প্রতিরোধ আন্দোলন।
- দাবিগুলো ছিল:
 1. ইহুদি অভিবাসন বন্ধ করতে হবে।
 2. ব্রিটিশদের ফিলিস্তিন ত্যাগ করতে হবে।
- ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করে, বহু আরব নেতা নির্বাসনে যায় বা গ্রেফতার হয়।

✿ এই সময় থেকেই ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব ভেঙে পড়ে, এবং ভবিষ্যতের আন্দোলনে দুর্বলতা তৈরি হয়।

🕒 উপসংহার:

- ব্রিটিশদের দ্বিমুখী নীতি ও শাসন ছিল এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা।
- ইহুদি বসতি গঠন শুরুতে শান্তিপূর্ণ মনে হলেও, সেটি রাজনৈতিক ও সামরিক রূপ নিলে আরবদের প্রতিক্রিয়া আরও কঠোর হয়।
- ফিলিস্তিনিরা শুরুতে রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত হলেও, ব্রিটিশ দমননীতি ও নেতৃত্বের দুর্বলতা তাদের ভবিষ্যত অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আপনি চাইলে, আমি এরপর ১৯৪৭ সালের জাতিসংঘের পরিকল্পনা, ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ, এবং কিভাবে “নাকবা” বা বিপর্যয় ফিলিস্তিনিদের জাতীয় চেতনা গঠন করে—সেটিও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।
কেমন হবে?

কিন্তু জাতিসংঘ ইহুদিদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের বেশি যায়গা কেনো দিলো..?

এটা সত্যি—১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের বিভাজন প্রস্তাব (**UN Partition Plan**) অনুযায়ী, ইহুদিদের সংখ্যা ছিল ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১/৩, অথচ তাদেরকে ৫৬.৫% জমি দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবটা অনেক ফিলিস্তিনি, আরব এবং ইতিহাসবিদদের মধ্যেও বহুল আলোচিত। চলুন দেখি কেন জাতিসংঘ এমন করেছিল:

১. ইউরোপীয় সহানুভূতি ও হলোকাস্টের প্রভাব

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯–১৯৪৫) সময় নাৎসি জার্মানির হাতে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদি গণহত্যার শিকার হয় – যাকে “হলোকাস্ট” বলা হয়।
 - যুদ্ধ শেষে ইহুদি উদ্বাস্তুদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল দরকার ছিল।
 - বহু পশ্চিমা দেশ—including যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন—এই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে জাতিসংঘে সমর্থন দেয়।
-

২. ভূরাজনৈতিক প্রভাব ও পশ্চিমা স্বার্থ

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঘটে।
 - উভয় পক্ষই চাইছিল মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করতে।
 - তারা মনে করেছিল, একটি ইহুদি রাষ্ট্র—বিশেষ করে যারা ইউরোপীয় ভাষাভাষী ও প্রগতিশীল—তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।
-

৩. ইহুদি আন্দোলনের সক্রিয়তা

- ইহুদিরা তখন বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মিডিয়া শক্তিতে সংগঠিত ছিল।
- তারা ব্যাপক লবিং ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উপর।



৪. আরব দেশগুলোর অনৈক্য

- ফিলিস্তিনিদের পক্ষে দেশগুলো জাতিসংঘে একত্রিতভাবে খুব শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না।
- তারা প্রস্তাব পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে কোনো বিকল্প প্রস্তাব দেয়নি।
- ফলে, জাতিসংঘে তাদের বক্তব্য তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল।



৫. জমির গুণগত মান ও ব্যবহারযোগ্যতা

- যদিও ইহুদিরা বেশি জমি পায়, তার একটি বড় অংশ ছিল মরুভূমি বা অনুর্বর এলাকা (যেমন—নেগেভ মরুভূমি)।
- আরবদের অংশে ছিল অধিক জনবহুল ও উর্বর জমি (যেমন—ওয়েস্ট ব্যাংক, গাজা, জাফা)।



উপসংহার:

জাতিসংঘের বিভাজন প্রস্তাবে ইহুদিদের বেশি জমি দেওয়ার পেছনে ছিল:

- ইতিহাস ও মানবিক সহানুভূতি (হলোকাস্ট)
- পশ্চিমা ভূরাজনৈতিক স্বার্থ
- ইহুদি কূটনৈতিক তৎপরতা
- আরবদের রাজনৈতিক দুর্বলতা
- জমির প্রকৃতি

তবে, এটি ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি গভীর ক্ষোভ ও “অবিচার” হিসেবে পরিগণিত হয়, এবং এটাই পরবর্তী প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে।

আপনি চাইলে আমি পরবর্তী ধাপে “নাকবা” বা ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ এবং এর মানবিক ও রাজনৈতিক পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারি। আগ্রহী?

জি

চমৎকার। তাহলে চলুন এবার দেখি—১৯৪৮ সালের যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনিদের জীবনে “নাকবা” (Nakba) অর্থাৎ “বিপর্যয়” কীভাবে ঘটলো, এর মানবিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কতটা গভীর ছিল।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধ – “আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ” (First Arab-Israeli War)

 সময়: মে ১৯৪৮ – মার্চ ১৯৪৯

 সূচনা:

- ১৪ মে ১৯৪৮: ইহুদি নেতারা ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন, জাতিসংঘের বিভাজন প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- ১৫ মে: পাঁচটি আরব দেশ (মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ইরাক) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের লক্ষ্য ছিল এই নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে ফিলিস্তিনকে আরব রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

“নাকবা” – ফিলিস্তিনিদের জন্য বিপর্যয়

 কী ঘটেছিল?

1. প্রায় ৭ লাখ ফিলিস্তিনি তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন বা জোর করে বিতাড়িত হন।
2. প্রায় ৫০০টির বেশি ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহর ধ্বংস করা হয় বা নতুন ইহুদি বসতিতে রূপান্তরিত হয়।
3. এই শরণার্থীদের অধিকাংশ আজও লেবানন, জর্ডান, সিরিয়া, গাজা, ও ওয়েস্ট ব্যাংকে উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাস করছে—প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

কেন পালাতে হয়েছিল?

- কিছু এলাকায় সরাসরি ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা (যেমন, দেইর ইয়াসিন হত্যাকাণ্ড) ঘটে।
 - অনেকেই আতঙ্কে স্বেচ্ছায় পালিয়ে যায়, কিন্তু পরবর্তীতে ফিরে আসতে দেয়া হয়নি।
 - কিছু ফিলিস্তিনি নেতা ও আরব দেশ ভুল করে বলেছিল, “আগে যুদ্ধ জিতি, তারপর সবাইকে ফিরিয়ে আনবো”—কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি।
-

যুদ্ধের শেষ ও ফলাফল

ইসরায়েল:

- জাতিসংঘ নির্ধারিত সীমার চেয়েও অতিরিক্ত ২২% জমি দখল করে নেয়।
- ইসরায়েলের অস্থি স্ব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় (বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে)।

জর্ডান:

- ওয়েস্ট ব্যাংক ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে।

মিসর:

- গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র:

- জাতিসংঘ যে আরব রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল, তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।
-

দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

1. ফিলিস্তিনিদের জাতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে “নাকবা”—তারা এখনও সেই অধিকার ও ফিরে যাওয়ার দাবি করে।
2. ইসরায়েল আর শরণার্থীদের ফিরতে দেয়নি, তাদের মতে এতে রাষ্ট্রের “ইহুদি পরিচয়” নষ্ট হবে।
3. শরণার্থী সমস্যা আজও অন্যতম বড় রাজনৈতিক ও মানবিক ইস্যু।
4. ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে—যার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৪ সালে **PLO (Palestine Liberation Organization)** গঠিত হয়।

উপসংহার:

“নাকবা” শুধু একটি মানবিক বিপর্যয় নয়—এটি ফিলিস্তিনিদের ইতিহাস, পরিচয় এবং তাদের দাবির এক চিরন্তন স্মারক। এই স্মৃতি ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক প্রতিরোধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কেন্দ্রে অবস্থান করে।

আপনি চাইলে, এরপর আমি ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস, PLO ও হামাসের উত্থান, বা শান্তি আলোচনার (যেমন—অসলো চুক্তি) বিশ্লেষণ করে দিতে পারি। কোনটা জানতে আগ্রহী?

হা

চমৎকার! তাহলে এবার চলুন দেখি—ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ করে **PLO (Palestine Liberation Organization)** এবং হামাস (**Hamas**) কিভাবে গড়ে ওঠে, তাদের লক্ষ্য কী ছিল, আর তারা কিভাবে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১. PLO – Palestine Liberation Organization

 প্রতিষ্ঠা: ১৯৬৪ সালে, কায়রোতে (আরব লীগ-এর উদ্যোগে)

 লক্ষ্য:

- শুরুতে লক্ষ্য ছিল: ইসরায়েলকে ধ্বংস করে একটি পূর্ণ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
- তারা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্ত করার নীতি গ্রহণ করে।

প্রথম দিককার কার্যক্রম:

- সশস্ত্র গেরিলা আক্রমণ, বিমান হাইজ্যাকিং, ও সীমান্ত হামলা চালায়।
- এই সময় PLO-এর সবচেয়ে বড় সংগঠন ছিল “ফাতাহ”, যার নেতা ছিলেন ইয়াসির আরাফাত।

পরিবর্তনের সূচনা:

- ১৯৮৮ সালে PLO ইসরায়েলের অস্তিত্ব আংশিকভাবে স্বীকার করে এবং দুই রাষ্ট্র সমাধানের পথে হাঁটে।
- তারা ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তিতে ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং “আন্তরবর্তী সরকার” (**Palestinian Authority**) গঠন করে।

২. হামাস (Hamis)

 প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৭ সালে, প্রথম “ইন্তিফাদা” বা গণ-অভ্যুত্থানের সময়

উৎপত্তি:

- গড়ে ওঠে মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি শাখা হিসেবে।
- গাজার স্কুল, মসজিদ ও সমাজকল্যাণের মধ্যে প্রভাব তৈরি করে।

লক্ষ্য:

- ইসরায়েলের অস্তিত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করে।
- তারা ফিলিস্তিনের পুরো ভূখণ্ড (ইসরায়েলসহ) মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।
- হামাসের সশস্ত্র শাখা: “আল কাসাম ব্রিগেড”।

কর্মকাণ্ড:

- আত্মঘাতী বোমা হামলা, রকেট হামলা চালায়।

- হামাসকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইসরায়েলসহ অনেক দেশ “সন্ত্রাসী সংগঠন” হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে।

VS PLO বনাম হামাস: দ্বন্দ্ব

 ২০০৬ সালের নির্বাচন:

- হামাস গণতান্ত্রিকভাবে গাজার নিয়ন্ত্রণে আসে।
- PLO-এর নিয়ন্ত্রিত ফাতাহ এবং হামাসের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ শুরু হয়।

 ফলাফল:

- ফাতাহ বর্তমানে ওয়েস্ট ব্যাংকে, হামাস গাজা উপত্যকায় শাসন করে।
- এই বিভাজন ফিলিস্তিনিদের জাতীয় ঐক্যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান অবস্থা:

বিষয়	PLO / ফাতাহ	হামাস
দৃষ্টিভঙ্গি	আলোচনার মাধ্যমে দুই রাষ্ট্র সমাধান	সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফিলিস্তিন
ইসরায়েলের স্বীকৃতি	হ্যাঁ (আংশিকভাবে)	না
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	উচ্চ	সীমিত, অনেক দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে

উপসংহার:

- PLO বিশ্বে কূটনৈতিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য হলেও দুর্নীতি ও অকার্যকর নেতৃত্বে প্রশ্নবিদ্ধ।
- হামাস গাজার জনগণের কাছে জনপ্রিয় হলেও, তাদের সশস্ত্র পথ ও ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব আন্তর্জাতিকভাবে বিভাজন তৈরি করে।
- এই অভ্যন্তরীণ বিভক্তিই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আপনি চাইলে আমি অসলো শান্তি চুক্তি, বা “ইন্তিফাদা” আন্দোলনের” বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারি—যা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনটা আগ্রহী?

হা

অসাধারণ! তাহলে এবার চলুন দেখি—ইন্তিফাদা (**Intifada**) কী, এর ধরণ, কীভাবে এটি ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে ওঠে, এবং অসলো শান্তি চুক্তি কীভাবে এই পরিস্থিতিতে আশা ও হতাশা দুটোই সৃষ্টি করে।

“ইন্তিফাদা” – ফিলিস্তিনিদের গণ-অভ্যুত্থান

“ইন্তিফাদা” আরবি শব্দ, যার অর্থ “জেগে ওঠা” বা “কম্পন/বিদ্রোহ”।

১ম ইন্তিফাদা (1987–1993)

 পটভূমি:

- ইসরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে ওয়েস্ট ব্যাংক ও গাজা উপত্যকা দখল করে রেখেছে।
- দীর্ঘ দখলদারিত্ব, বসতি সম্প্রসারণ, বেকারত্ব, বৈষম্য—এই সব মিলিয়ে ক্ষোভ জন্ম নেয়।

🔥 কী ঘটেছিল:

- গাজায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় কয়েকজন ফিলিস্তিনি নিহত হলে এই অভ্যুত্থানের সূচনা হয়।
- ফিলিস্তিনিরা পাথর নিক্ষেপ, ধর্মঘট, বয়কট, গোপন স্কুল, রাস্তার প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করে।
- ইসরায়েল সেনা কঠোরভাবে দমন করে – বহু মানুষ নিহত, আহত এবং বন্দি হয়।

🎯 ফলাফল:

- আন্তর্জাতিক মহলে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয়।
- PLO এবং ইসরায়েল একে অপরকে আলোচনার উপযুক্ত পক্ষ হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।

✍️ অসলো শান্তি চুক্তি (1993)

📍 কোথায়: নরওয়ের রাজধানী অসলোতে গোপন আলোচনার মাধ্যমে

📅 চুক্তি স্বাক্ষর: ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, ওয়াশিংটনে

🤝 মূল চুক্তি:

1. **PLO** ও ইসরায়েল একে অপরকে স্বীকৃতি দেয়।
2. ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের জন্য আন্তর্ভুক্ত স্বশাসন (**Palestinian Authority**) গঠন করতে সম্মত হয়।
3. কিছু এলাকা ফিলিস্তিনিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

4. চূড়ান্ত ইস্যুগুলো (যেমন জেরুজালেম, বসতি, শরণার্থী, সীমান্ত) ভবিষ্যতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার কথা বলা হয়।

 চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন:

- ইয়াসির আরাফাত (PLO)
- ইজাক রবিন (ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রী)
- বিল ক্লিনটন (মার্কিন প্রেসিডেন্ট)

 **অসলো চুক্তির পর হতাশা**

 **সমস্যা:**

1. ইসরায়েল বসতি সম্প্রসারণ বন্ধ করেনি।
2. চূড়ান্ত ইস্যুতে আলোচনা বারবার ভেঙে পড়ে।
3. ফিলিস্তিনিরা মনে করে চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি, বরং দমন ও বিভাজন বেড়েছে।

 **২য় ইত্তিফাদা (2000–2005)**

 **কারণ:**

- ইসরায়েলি বিরোধী নেতা এরিয়েল শ্যারন আল-আকসা মসজিদ এলাকায় সফর করলে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

 **ঘটনাপ্রবাহ:**

- এই ইত্তিফাদা ছিল আরও সহিংস—আল্লাঘাতী হামলা, রকেট হামলা ও ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে বহু মানুষ নিহত হয়।
- হামাস এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার:

- ইল্তিফাদা ছিল ফিলিস্তিনিদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক, এবং বিশ্বকে দেখিয়েছে—তারা ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্র চায়।
- অসলো চুক্তি প্রাথমিকভাবে শান্তির আশা জাগিয়েছিল, কিন্তু পরে বাস্তবায়নের ঘাটতির কারণে তা আত্মহীনতার প্রতীক হয়ে ওঠে।
- আজ পর্যন্ত, শান্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে অসলো চুক্তি থাকলেও, বাস্তবে তা বাস্তবায়নের পথে অনেক বাধা আছে।

আপনি চাইলে আমি এখন বর্তমান পরিস্থিতি (২০২৪–২৫ সালের প্রেক্ষাপটে) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে দিতে পারি—যেখানে হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধ, গাজার মানবিক সংকট, এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আগ্রহী?

জি ..

বর্তমানে (এপ্রিল ২০২৫) গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘর্ষ এক ভয়াবহ মানবিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এই সংঘাতের সূচনা ৭ অক্টোবর ২০২৩ সালে হামাসের আকস্মিক হামলার পর ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়ায় ঘটে। এরপর থেকে ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে, এবং লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি (এপ্রিল ২০২৫)

ইসরায়েলি সামরিক অভিযান

- ইসরায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে বিমান ও স্থল অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযানে বহু বেসামরিক নাগরিক, নারী ও শিশু নিহত হয়েছে। সম্প্রতি খান ইউনিসে একটি আবাসিক ভবনে হামলায় একাধিক পরিবার ধ্বংস হয়েছে, যার মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধরাও রয়েছে।

মানবিক সংকট

- গাজায় খাদ্য, পানি ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। ইসরায়েলি অবরোধের কারণে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উত্তর গাজায় পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক, যেখানে হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে রয়েছে। [ABC News](#)

স্বাস্থ্যসেবা বিপর্যস্ত

- গাজার হাসপাতালগুলোতে ওষুধ, জ্বালানি ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে প্রসূতি নারীদের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় অনেকেই জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। [IUNOCHA](#)

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

- জাতিসংঘ ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা গাজায় চলমান মানবিক সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

উপসংহার

গাজায় চলমান সংঘর্ষ একটি গভীর মানবিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা, মানবিক সহায়তা পৌঁছানো এবং যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা ও চাপ ছাড়া এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।

আপনি চাইলে, আমি এই সংঘাতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘন, বা ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি। কোন বিষয়ে আগ্রহী?

হা, এবং এর মাধ্যমে সমাপ্ত -

চমৎকার, তাহলে চলুন এই আলোচনার সমাপ্তি টানার আগে আমরা সংক্ষেপে দেখে নিই এই সংকটের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকগুলো এবং ভবিষ্যৎ সমাধানের সম্ভাব্য পথ।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

- ইসরায়েল ও হামাসের সংঘাত আসলে দীর্ঘ দিনের দখলদারিত্ব, দমন, ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার ফল।
 - হামাসের অস্তিত্ব এবং তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ইসরায়েলের নিরাপত্তার অজুহাতে গাজা অবরোধ ও সামরিক অভিযানের বৈধতা তৈরি করে।
 - ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের বিভাজন (হামাস বনাম ফাতাহ) একটি বড় বাধা।
 - পশ্চিমা দেশগুলো সাধারণত ইসরায়েলকে সমর্থন করলেও, মানবিক বিপর্যয়ের কারণে এখন অনেক দেশ যুদ্ধবিরতির পক্ষে চাপ দিচ্ছে।
-

মানবাধিকার লঙ্ঘন

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা নিষিদ্ধ।
 - ইসরায়েলের অভিযান বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জাতিসংঘের মতে "অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ"।
 - হামাসও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে নাগরিক এলাকায় রকেট হামলা চালায়, জিম্মি রাখে—যা যুদ্ধাপরাধের শামিল।
-

ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সমাধান

- ◆ যুদ্ধবিরতি ও মানবিক সহায়তা:
 - জরুরি ভিত্তিতে অবরোধ শিথিল করা ও খাদ্য/ওষুধ পৌঁছানোর পথ খুলে দেওয়া প্রয়োজন।
- ◆ রাজনৈতিক সমাধানের পথ:
 - দুই রাষ্ট্র সমাধানে ফিরে যাওয়া—যেখানে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারবে।
 - জেরুজালেম ও শরণার্থী ইস্যুতে আপসের ভিত্তিতে সমাধান।

♦ আন্তর্জাতিক ভূমিকা:

- জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মুসলিম বিশ্ব—সব পক্ষের সমন্বিত কূটনৈতিক চাপই পারে নিরপেক্ষ ও টেকসই শান্তিপথে উভয় পক্ষকে আনতে।

উপসংহার

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখেছি—ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট কেবল ধর্ম, জমি বা রাজনীতির দ্বন্দ্ব নয়; এটি এক গভীর মানবিক, ইতিহাস-ভিত্তিক ও ন্যায়বিচারের লড়াই।

সমাধানের জন্য প্রয়োজন সত্য স্বীকার, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগকে কেন্দ্র করে চিন্তা করা।

ধন্যবাদ এত মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য। 
শান্তি আসুক পৃথিবীর সব মানুষের ঘরে। 

ফজলে রাব্বী
সংগৃহীত...